বাংলা থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত রুপরেখা

শান্তিসুধা মুখার্জ্জী

একালে যাকে নাটক বলে বাংলায় তার ইতিহাস বেশীদিন নয় । মাত্র দেড়শ বছর আগে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি প্রথম বাংলা ন াটক লেখা হয়েছিল এবং তারই কাছাকাছি সময় থেকে কলকাতায় কোনো কোনো ধনবানের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে বাংলা নাটকের অভিনয়ও শুরু হয়েছিল । সেদিন থেকে আজ অবধি নানা রকম অবস্থার মধ্য দিয়ে এ ধারাটি সচল রয়েছে । বহু শাখা প্রশাখায় ব্য াপ্ত হয়েছে এবং আমাদের জাতীয় জীবনের নানা পর্যায় তাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে । এ ইতিহাস তাই আলোচনার যোগ্য ।

অন্যান্য সাহিত্যশাখার সঙ্গে নাটকের অনেক তফাৎ আছে । তা হল অন্যান্য শাখাগুলি শুধু পাঠ্য । নাটক পাঠ্য এবং দৃশ্য দুইই । শেক্স্পিয়র বা রবীন্দ্রনাথের নাটক শুধু পড়েও উপভোগ করা যায় । কিন্তু অভিনিত হলে এর ভিতরকার শক্তি ও সৌন্দর্য যেন আরও বেশী করে ফুটে ওঠে । শুধু তাই নয় , সাহিত্য হিসাবে যে নাটক হয়ত নিতান্ত সাধারন , ভালো প্রযোজনা ও ভালো অভিনেতার হাতে পড়লে তা অসাধারন হয়ে উঠতে পারে । অর্থাৎ নাটক তার পূর্ন বিকাশের জন্য অভিনয়ের অপেক্ষ া রাখে । এদিক থেকে গানের সঙ্গে তার মিল আছে । গান যেন কবিতাও বটে । সুরসংযোগে তার দিগন্ত অনেকখানি বেড়ে যায় , নাটকও তেমনি। এই কারনে সভ্য মানুষের কাছে চিরকালই নাটকের আদর হয়েছে । সংস্কৃত আলংকারিকেরা তো বলেই গেছেন ”কাব্যেষু নাটকং রম্যম্ ।”

নাটকের তাই দুটো দিক , একটি সাহিত্যের দিক , একটি অভিনয়ের দিক । বাংলা নাটকের এই দুই দিক নিয়েই পন্ডিতজনেরা গবেষনা করেছেন এবং বহু উচচমানের ইতিহাসগ্রন্থ আছে । আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমরা সে সব বিশদ তথ্যপঞ্জীর বিশ্লেষণে না গিয়ে শুধু এই দেড়শ বছরের মূল প্রবনতাগুলি জানাব । অর্থাৎ এটা হবে বাংলা নাটকে এক নজরে দেখে নেবার একটি সামান্য প্রয়াস ।

নিয়মমাফিক প্রথম বাংলা নাটক ১৮৫২-র আগে লেখা না হলেও বাঙ্গালী জাতির আবহমান ইতিহাসে বরাবরই নাটকের মত নানা জিনিস ছিল । মধ্যযুগে কথক ঠাকুরেরা আসর সাজিয়ে মৃদঙ্গ মন্দিরা চামর সহযোগে ঈষৎ অঙিনয় করেই পালাগানগুলি গাইতেন । তাছাড়া ছিল নাট্যগীতপালা । যা অনেকটা আধুনিক গীতিনাট্যের প্রকারভেদ । চৈতন্যজীবনীগুলিতে দেখা যাচ্ছে স্বয়ং মহাপ্রভু গার্হস্থ জীবনকালে এরকম পালায় অংশ নিয়ে অভিনয় করেছেন । ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হল , বিংশ শতক বিবর্তনজাত যাত্র ার এবং কথকতার খুবই প্রচলন ছিল । সাধারনের রসপিপাসা তাতেই মিটত ।

কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন রইল না । ইতিমধ্যে এদেশে ইংরেজ রাজত্ব সুরু হয়েছে , এবং শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন সমাজ । মধ্যযুগের পরে ভারতীয় সভ্যতার পুরনো কাঠামোটিই বদলে যাচ্ছে । নবশিক্ষিতের মনে সেই পথ ধরেই এসেছে নতুন নাটকের চাহিদা ।

সেকালের ইংরেজ জাতি খুব নাট্যপ্রিয় ছিল , এদেশে এসে পলাশির যুদ্ধের আগেই তারা প্রতিষ্টা করেছিল নিজেদের থিয়েট ার । সম্ভবতঃ বিদেশ বিভুঁই জায়গায় এগুলোই ছিল তাদের মেলামেশা ও বিনোদনের ক্ষেত্র । কয়েক দশক পরে দেশীয় লোকেরা তাদের রীতিনীতি জেনেছে তখন তাদের ইচ্ছা হল থিয়েটার করবার । এইভাবে বিলিতি নাটকের রসগ্রহণ , শিক্ষা বিস্তার হেতু প াশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় , শিক্ষিত সমাজে নতুন করে সংস্কৃত চর্চ া এবং সংস্কৃত নাটকের প্রতি আগ্রহ , এই সবের মধ্য দিয়ে জা তির নাট্যচেতনা ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করে চলেছিল প্রায় অর্ধশতক ধরে । অনুকুল সময় তখনই আসে নি । অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে হেরাসিম লেবেডফ নামে একজন রুশ শিল্পী দুটি বিদেশী নাটকের আংশিক বঙ্গানুবাদ করে এই কলকাতাতেই অভিনয় করেছিলেন । কিন্তু জাতির চিত্তক্ষেত্রে তখনও তৈরি ছিল না বলে এ অভিনয়ের বিশেষ প্রভাব সমাজে পড়ে নি । তার ধারাবাহিকত াও থাকে নি । সেই ধারাবাহিকতা তৈরি হবার সময় এল ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এসে ।

বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায় (১৮৫৩-১৮৭২) ঃ সাধারন রঙ্গালয় স্থাপনের পূর্বকাল -------

থিয়েটার একটা যৌথ প্রয়াস । তার জন্য লোকবল ও অর্থবল চাই । সেটা আসে হয় সরকারি দানে , নয়ত পাঁচজনের চাঁদ ায় , নয়ত ধনবানের দানে । সেকালের পরাধীন দেশে সরকারি দানের কথা ছিল না । পাঁচজনের ব্যাপারটাও চালু হয়নি । প্রথম দিকে নাটকের উদ্যোক্তা ছিলেন নাটকের কিছু ধনবান ব্যাক্তি । যাদের সময় অর্থ এবং শিক্ষা তিনটিই আছে । এঁদের মধ্যে পড়েন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর , আশুতোষ দেব , ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ , ও প্রতাপ চন্দ্র সিংহ (দুই ভাই) , কালিপ্রসন্ন সিংহ , যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি । তখন কোনো পেশাদার অভিনেতা ছিল না । এদের বন্ধুবান্ধবরা নিজেরাই কোনো পেশাদার অভিনেতা ছিল না । এঁদের

বন্ধুবান্ধবরা নিজেরাই অভিনয় করতেন । স্ত্রী ভুমিকাতে পুরুষরাই নামতেন । নাটক বলতে বেশীরভাগই ছিল সংস্কৃত বা ইংরাজি নাটকের অনুবাদ । এরই মধ্যে তারাচরন শিকদারের ভদ্রার্জুন এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের কীর্তিবিলাস নামক দুটি মৌলিক নাটকের জন্ম হল । ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ন তর্করত্ন লিখলেন কুলীনকুলসর্বস্ব । ১৮৫৯ এ শর্মিষ্ঠা নিয়ে মধুসূদনের এবং ১৮৬০ এ নীলদর্পন নিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের অভ্যুদয় হল । শেষোক্ত এই দুই নাট্যকার নবজাত বাংলা নাটককে মূহূর্তের মধ্যে উত্তীর্ন করে দিলেন পরিনত নাট্যচর্চার ভুমিকাতে । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রায় প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ ।

সবই হল , তবু সেকালের রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকালে অনুভব করি একটা নিরুপায়তার বোধ তাকে ঘিরে আছে । নাটকটা ছিল রাজাদের খেয়ালখুশির ব্যাপার । অভিনীত হবে এই আশা নিয়ে লেখক হয়ত লিখলেন , উদ্যোক্তাদের পছন্দ হল, মহল্লা শুরু হয়ে গেল , কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা মঞ্চস্থ হল না এমন ঘটনা ঘটত । এমনটাই হয়েছিল মধুসূদনের ক্ষেত্রে । পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে তিনি প্রহসন লিখলেন । কিন্তু মহলার সময় রাজাদের বন্ধুমন্ডলীর কেউ কেউ মনে করলেন তাঁদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে । রাজারা জানতেন এটা সত্য নয় , তবুও ঝামেলায় না যাবার জন্য তাঁরা পুরো অভিনয়টাই বন্ধ করে দিলেন । তাছাড়া কোনো মঞ্চই স্থায়ী হত না । দু চারটি নাটক দু একবার অভিনয় হলেই উদ্যোক্তাদের শখ মিটে যেত , রঙ্গমঞ্চ উঠে যেত । এ ছাড়াও দর্শকসংখ্যা ছিল সীমিত , কারন নিয়ন্ত্রিত অতিথি ছাড়া এইসব ব্যাক্তিগত অনুষ্টানে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না ।

বাংলা নাটকের দ্বিতীয়পর্যায় সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন১৮৭২ এরই ভেতর থেকে তৈরি হয়ে উঠছিল অন্যতর ইতিহাস । উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের কয়েকজন যুবক একটা নাটকের দল গড়েছিলেন । তাঁদের অর্থবল ছিল না । কিন্তু যে কোনও বড় জিনিস তৈরি করতে গেলে যে দায়বদ্ধতা দরকার তা ছিল । থিয়েটার এঁদের শখের ব্যাপার নয় । একান্ত ভালোবাসার ছিল ।এই দলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি,অমৃতলাল বসু,অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, মতিলাল সুর প্রভৃতি । এঁরা নিজেরা চাঁদাকরে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার প্রতি ষ্ঠা করলেন এবং প্রথম অভিনয় করলেন দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী । পরবর্তী কালে স্মৃতিচারন করতে গিয়ে গিরিশ ঘোষ দীনবন্ধুকে প্রনতি জানিয়ে বলেছিলেন তাঁর নাটক না থাকাকালে সেদিনের কয়েকটি সহায় -সম্বলহীন যুবার স্বপ্ন পূরন হত না । বলবার কারন দীনবন্ধুর নাটকের পাত্র পাত্রীরা ছিল সমসাময়িক কলকাতা শহরের মানুষজন । তৎকাল প্রচলিত জাঁকজমক পূর্ন পৌরানিক নাটক করতে গেলে যে ব্যয় বহুল পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যসজ্জার দরকার হত তা দেবার সম্বল এঁদের ছিল না ।

এঁদের অভিনয় এত সফল হল এবং চেনাশোনা মহলে তা দেখবার জন্য আগ্রহ জাগল যে উদ্যোক্তাদের মনে হল এমেচার থিয়েটারটিকে সাধারন রঙ্গালয়ে পরিনত করলে কেমন হয় । যেকোনো লোক টিকিট কেটে দেখতে থাকলে তাঁদের অর্থসমস্যা মেটে । লোকেরও নাট্যপিপাসা চরিতার্থ হয় । এরকম একটি থিয়েটারের নাম তাঁরা দিলেন ন্যাশানাল থিয়েটার এবং অচিরে এই পরিকল্পনা কাজে পরিনত করতে নেমে পরলেন । প্রথম দিকে গিরিশচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে একমত হন নি । জাতীয় রঙ্গালয়ে করতে গেলে যে পেশাদারি দক্ষতামান বজায় রাখা উচিত সেটা তাঁদের ছিল না বলেই তাঁর আপত্তি । কিন্তু তাঁর মত টেঁকে নি। অন্যরা দলে ভারি ছিল এবং তাঁরা একযোগে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জোড়াসাঁকোর মধুসুদন সান্যালের বাড়িতে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন নাটক নিয়ে ন্যাশানাল থিয়েটারের পত্তন করলেন । প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে ভিন্নমত পোষন করলেও গিরিশচন্দ্র তাঁর বন্ধুদের অবৈতনিক অভিনেতা ও পরিচালক রুপে বরাবরই সাহায্য করে গেছেন । অবশেষে ন বছর পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যে সাধারন রঙ্গালয়ে যোগ দিলেন নট নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক এই তিন ভুমিকায় যুগপৎ নেতৃত্ব দিয়ে তদানীন্তন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রানপুরুষ রুপে ইতিহাসে জায়গা করে নিলেন ।

১৮৭২ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর সাধারন রঙ্গালয়ে আদিযুগ মনে করা যেতে পারে । এই সুদীর্ঘকাল ধরে অভিনয় কলা মোটামুটি একই খাতে হয়েছিল । যদিও নাটক, রঙ্গমঞ্চ , অভিনেতা , প্রয়োগ কৌশল সব দিকেই প্রভূত উন্নতি রচনার ক্ষেত্রে একটা জোয়ার এসেছে । ১৮৫২-৭২ রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের পূর্ববর্তি এই কালসীমার যে কটি নাটক লেখা হয়েছিল তা হাতে গোনা যায় । এখন এক লাফে তা দশগুন বেড়ে গেল । পরিসংখ্যান বলছে ১৮৭২ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত প্রথম দশ বছরেই ২২৫ টি নতুন নাটক লেখা হয়েছে এবং ১৩০ জন নাট্যকার এগুলি লিখেছেন । এই ধারা অব্যাহত ছিল , বুঝতে অসুবিধা হয় না এগুলির মধ্যে অধিকাংশই উচচমানের ছিল না , কিন্তু নাটক ও নাট্যকারের সংখ্যাধিক্য প্রমান করে দেশমধ্যে নাটকের একটা জোরালো হাওয়া উঠেছে । এই পর্বে সর্বপ্রধান নাট্যকারদের মধ্যে আগের আমলের মাইকেল, দীনবন্ধু , রামনারায়ন তর্করত্ন তো প্রথম দিকে ছিলেনই । এছাড়াও পরে যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর , অমৃতলাল বসু , উপেন্দ্রনাথ দাস , বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় , অতুলকৃষ্ণ মিত্র , রাজকৃষ্ণ রায় , অমরেন্দ্রনাথ দত্ত , ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ , মনোনোহন রায় , মনমোহন গোস্বামী , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , দ্বিজেন্দ্রলাল রায় , এবং সর্বোপরি নাট্যজগত ব্যাপ্ত করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ । অপ্রধান নাট্যকারদের সীমা পরিসীমা নেই । এই সব নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ , রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল সাধারন রঙ্গালয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন না । কিন্তু অন্যেরা প্রায় সকলেই কোনো না কোনো দিক দিয়ে রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ।

রঙ্গমঞ্চের সংখ্যাও বেড়েছিল । ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী দশবছরে তাদের সংখ্যা ছিল তিন -- ন্যাশানাল , গ্রেট ন্যাশান াল ও বেঙ্গল । ক্রমে তা বাড়তে বাড়তে বিংশ শতকের প্রথম দশকটিতেই সর্বধিক সংখ্যক রঙ্গমঞ্চের সন্ধান মেলে , ১১ টি -- মিনার্ভা , ক্লাসিক , অরোরা , ইউনিক , ষ্টার , গ্রান্ড থিয়েটার , ন্যাশানাল ও গ্রেট ন্যাশানাল , গ্র্যান্ড ন্যাশানাল , কোহিনুর ও নিউ ক্লাসিক । এতগুলি মঞ্চ চলত কিভাবে এ প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক । উত্তর এই যে চলত না । অর্থভাব , মামলা , মোকদ্দমা , দলাদলি , দর্শক ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভাঙিয়ে আনা এই সব ব্যাধি লেগেই থাকত ।

এরই মধ্যে মঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কেউ কেউ অমানুষিক ত্যাগস্বীকার করেছেন । এই পর্বেই দেখা দিয়েছেন প্রবাদ প্রতিম সব অভিনেতারা । যাঁদের অভিনয়ের স্মৃতি আজও কীংবদন্তী হয়ে বাঙ্গালীর মনে বেঁচে আছে । এই পর্বেই ঘটেছে নানা গুরুত্ব পূর্ন ঘটনা । যেমন উপেন্দ্র দাসের সুরেন্দ্র বিনোদীনি , নাটক অবলম্বন করে রাজদ্রোহের অভিযোগ ওঠে এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ন াট্যনিয়ন্ত্রন আইন জারী হয় । এই পর্বেই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সতী কি কলঙ্কিনী নাটকে প্রথম মেয়েরা স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করল । তার অ াগে পুরুষেরাই স্ত্রী র ভুমিকায় অভিনয় করতেন । এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ই নাটকে নতুন নতুন গিমিক আনবার রীতি চালু হয়েছিল । সেকালে কলকব্জার এত উন্নতি হয়নি । তবু দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য অপ্সরীর সর্গে আগমন দেখানো হত উপর থেকে কপিকলে করে অভিনেত্রীকে মঞ্চে নামিয়ে । অমরেন্দ্র দত্ত যোদ্ধা বা জমিদারের ভুমিকা থাকলে সত্যিকারের ঘোড়া য় চড়ে মঞ্চে ঢুকতেন । তখনও বিদ্যুৎ বাতি আসেনি । গ্যাসের আলোয় অভিনয় হত । কিন্তু ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গোপাল লাল শীল এ্যামারেল্ড থিয়েটারে ড াইনামো এনে ইলেকট্রিকের আলো জ্বালিয়েছিলেন । এই কপিকল , ঘোড়া, ইলেকট্রিকের আলো সবই আনা হয়েছে দর্শক টানবার জন্য । প্রতিযোগীতার তাগিদে । এই তীব্র প্রতিযোগীতার তাগিদেই গড়ে উঠেছে পেশাদারিত্ব । আজকের অভিনেতা আলো ও ম াইকের সাহায্য পান । সেকালে এসব ছিল না । আবৃতির কৃৎকৌশল ও স্বরপ্রক্ষেপন প্রত্যেক অভিনেতাকে যত্ন করে শিখতে হত । হ াজারো অসুবিধার মধ্যে শুধু অভিনয়ের শক্তিতে সেকালের অভিনেতারা ভুমিকাগুলিকে জাগ্রত জীবন্ত ও অমর করে রেখে গেছেন , কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে ছেন বাড়িয়ে তুলেছেন বাংলা নাটক ও অভিনয়ের ধারাটিকে ।

যেসব নাটক সেকালে অভিনীত হত সেগুলি মোটামুটি নিম্নলিখিত প্রকার --

১) পৌরানিক নাটক

২) ঐতিহাসিক ও ইতিহাসমিশ্রিত রোমান্স

৩) সামাজিক নাটক ও প্রহসন

৪) গীতিনাট্য

৫) জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরুপ

এই শ্রেনীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যা ছিল পৌরানিক নাটকের কারন সেটাই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় । তারপরের স্থান ঐতিহাসিক রোমাঞ্চগুলির প্রাপ্য , বিশেষ করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কে কেন্দ্র করে দেশে স্বাদেশিকতার যে জোয়ার এসেছিল সেই অনুকুল লগ্নই ছিল ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্নযুগ । ইতিহাসের বীরপুরুষের মধ্যে পরাধীন জাতি নিজের ইচ্ছা পুরনের পথ খুঁজে পেত । এর পরের স্থানটি অবশ্যই সামাজিক নাটককে দেওয়া যায় । এগুলি দুধরনের হত -- ১) করুনরসাত্মক যেমন -- গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল কিংবা বলিদান , ২) হাস্যরসাত্মক -- যেমন অমৃতলাল বসুর খাসদখল কিংবা ব্যাপিকা বিদায় । বিংশ শতকের দোড়গোড়ায় এসে দেখা যাচ্ছে প্রচলিত কাহিনীর নাট্যরুপ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে । মৌলিক নাটকের তাগিদ ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে । এর কারন ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী কাহিনী কারেরা এসে গেছেন । জনপ্রিয় গল্প উপন্যাসের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । বাংলা সাধারন রঙ্গমঞ্চের এই প্রথম যুগ মুলতঃ গিরিশ প্রভাবিত । এই যুগের নাট্যপ্রবনতাগুলি এক হিসাবে তিনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন । তাঁর শক্তি ও দূর্বলতা দুইই যেন বাঙ্গালী জাতীর শক্তি ও দূর্বলতার প্রকাশ এমনটিই আজকের নিরপেক্ষ বিচারে মনে হয় । আসলে গিরিশচন্দ্র আপামর জনসাধারনের মর্মস্থানটি ভালো করে বুঝেছিলেন । শুধু ব্যাবসায়িক বুদ্ধিতে নয় , আপন অন্তরে । আমাদের প্র াচীন যাত্রাপালায় দীর্ঘকাল যে পৌরানিক মুল্যবোধ , কাহিনী রস , ও গীতিধর্মিতা ছিল তার ঐতিহ্য আমাদের গুঢ় চেতনায় প্রবিষ্ট ছিল । নব্যযুগের বাঙ্গালী যাত্রাপালাকে তার অসংস্কৃত পুরনো রুপে বজায় রাখতে চাননি নিশ্চয়ই । কিন্তু বহু শতাব্দী ব্যাপি সেই পূর্ব সংস্কার তার অন্তরের মধ্যে সুপ্ত ছিল । গিরিশচন্দ্র ও তদনুসারী নাট্যকারদেরর রচনায় তা নতুন করে জ্বলে উঠল । পৌরানিক ন াটকের তাই এত জনপ্রিয়তা হয়েছিল । তা ছাড়া আর একটি লক্ষননী য় বৈশিষ্ট একালের নাট্যসাহিত্যে ছিল । তা হল এখানে কখনো মুল্যবোধের বিরুদ্ধচারন করা হয়নি , মধুসুদন তার প্রহসন দুটিতে যে নির্ভিক সমাজ সমালোচনা করেছিলেন বা দীনবন্ধু তার নীলদর্পনে সমকালীন গ্রামবাংলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চেহারা তুলে ধরেছিলেন পরবর্তী নাট্যসাধনায় সেই সাহস বা অর্ন্তদৃষ্টি আর দেখি না । এমন কি সমসাময়িক গল্প উপন্যাসে জীবনের যে জটিলতা ফুটে উঠেছিল এবং প্রকরনের যে নতুন নতুন পরীক্ষা হচ্ছিল সেদিকে ও সমকালীন নাট্যসাহিত্য মন দেয়নি ,বরং সেইসব সুক্ষ্ম জটিল উপাখ্যান যখন নাটকায়িত হত তখন চরিত্রের তীক্ষন কোনগুলিকে ভেঙে দিয়ে সবকিছুকে মসৃন ও সুগোল করে দেখবার প্রবনতাই জয়ী হত । এক কথায় বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় বেগ ,

ভাবনার চেয়ে উন্মাদনা , যুক্তির চেয়ে ভক্তিবিন্যাসের প্রাধান্য ছিল বেশী । জনতার দরবারে নাটক নেমে এসেছিল এটা যেমন তার গৌরব , তেমনই আমজনতার বোধবুদ্ধি ও চাহিদার মাপ অনুযায়ী তাকে চলতে হয়েছে এটা তার সীমাবদ্ধতা । সাহিত্যের অন্যান্য শ াখার লেখকরা নিরবধিকালের কথা ভেবে লিখতে পারেন , অন্ততঃ কিছুদুর পর্যন্ত পারেন । কিন্তু সেকালের কঠিন পরিস্থিতিতে ন াট্যমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেদের জনতার চাহিদার বাইরে যাবার উপায় ছিল না । ব্যাবসায়িক অভিনয়ে একালেই কি আছে ?

তবু এরই মধ্যে অসাধারন অভিনেতার া এসেছেন এবং ঘোরতর অর্থসংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটক রচনা ও অভিনয়ের ধারাটিকে রক্ষা করে গেছেন । এই ভাবেই কেটেছে পঞ্চাশ বছর ।

সাধারন রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় পর্যায় ১৯২১-- ৪৭

বিনোদনের একটাই শর্ত এই যে তাকে ক্রমাগত নতুন জিনিস জুগিয়ে যেতে হয় । সাধারন রঙ্গমঞ্চ সেটা করত অল্পদিন পরপর নাটক বদলে দিয়ে , পরবর্তী কালে যেমন এক অভিনয়ে শত রজনী পার করেছে তখন সেটা ছিল অভাবনীয় । বিনোদনমুখী করতে সেকালে নাটকে অজস্র গান যুক্ত হত । গানের একটা শ্রেনী হয়ে গেছে থিয়েটারের গান নামে। আর ছিল কিছু কলা কৌশলের চমৎকারিত্ব , যেমন ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চে ঢোকা , বা নায়ক যদি জলে ঝাঁপ দিতেন তো পশ্চাৎপটে জল ছিটকে ওঠা প্রভৃতি ।কিন্তু এত করেও রঙ্গমনঞ্চের ভিতরকার জীর্নদশা আর ঢাকা যাচ্ছিল না । ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র , অর্ধেন্দুশেখর ,অমৃতলাল প্রভৃতি পুরনো দিনের দিকপালের । সকলেই প্রয়াত । নতুন ভালো অভিনেতা আছেন বটে,কিন্তু সকল দিক ধরে রাখতে ও এগিয়ে যেতে প্রতিভা লাগে তেমন প্রতিভাধর কেউ নেই । রঙ্গমঞ্চ তার জৌলুশ হারাচ্ছিল । এই সময় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সেখানকার আকাশে এক নতুন নক্ষত্রের উদয় হল এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বিকীর্ন ধমনীতে সঞ্চারিত হল নূতন রক্তধারা ।

এই নক্ষত্রের নাম শিশির কুমার ভাদুড়ি । ম্যাডান কোম্পানি (পরবর্ত্তীকালে বাংলা চলচিচত্র
শিল্পের পথিকৃত) বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি নাম দিয়ে এক সাধারণ রঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তদানীন্তন এমেচার থিয়েট ারেব উজ্জল অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়িকে তাঁদের প্রধান অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক করে নিয়ে আসেন । ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্য াবিনোদের আলমগীর ন াটকটিকে শিশিরকুমার সম্পূর্ন নতুন প্রয়োগ পদ্ধতি ও অভিনয়কলায় মন্ডিত করে ১৯২১খৃষ্টাব্দের ডিসেম্ বর মাসে মঞ্চস্থ করলেন । এই অভিনয়ে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে একনতুন যুগের সূচনা হল ।

শিশিরকুমার পুরনো ধারার নাটকই অভিনয় করেছিলেন । সেই ঐতিহাসিক ও পৌরানিক নাটক এবং উপন্যাসের নাট্যরূপ। কেবল আগের যুগে যেখানে বঙ্কিমের রচনাই বেশী নেওয়া হত এখন তার জায়গায় নেওয়া হল শরৎচন্দ্রের উপন্যাস । বস্তুতঃ নতুন ধরনের নাটক শিশির কুমার পাননি ।তিনি যা কিছু নতুনত্ব আনলেন তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে । তাঁর নাটক ছিল নির্দেশকের নাটক। নাটকের দৃশ্যসজ্জা , পোশাক পরিচ্ছদ , আলোকপ্রক্ষেপ , আবহধবনি, সময়সীমা, প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রের হাঁটা চলা , দাঁড়ানো সব কিছু যে এক সুরে বাঁধা সেটা তিনিই প্রথম দেখালেন । এই বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হল ত ার নিজস্ব অভিনয়রীতি । আগের যুগে অভিনয় ছিল খানিকটা অতিনাটকীয় , উঁচু পর্দায় বাঁধা । শিশির কুমার আনলেন খানিকটা সংযত অভিনয় । ফলে তাঁর নাটকে চরিত্র গুলি একটা গভীরতা পেত এবং নাট্যকাঠামোটি অতিক্রম করে জাগ্রত ও জীবন্ত হয়ে উঠত , যোগেস চৌধুরির সীতা নাটকে রামের যে অভিনয় তিনি করতেন তা আজও এদেশে কিংবদন্তী হয়ে আছে । অথচ সাহিত্য হিসাবে ও নাটক নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর । বাহুল্য বর্জিত ইঙ্গিতধর্মী দৃশ্যপট তিনি সংকেতে বিরাটের একটা ইঙ্গিত দিতে চাইতেন , যেটা রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের নাটকে করেছেন এবং পরবর্তিকালে গ্রুপ থিয়েটারগুলি করছে । এই সুক্ষ্ম ও বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশনা সেক ালের ব্যাবসায়িক থিয়েটারের রীতিনীতি থেকে ভিন্ন ছিল । তাই নিজের পরিকল্পনামত নাটক করবার বাসনায় শিশির কুমার প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার থেকে সরে এসে থিয়েটার প্রেমী মানুষদের নিয়ে যৌথ মালিকানায় রঙ্গালয় গড়তে চেয়েছিলেন । আর্য থিয়েটার , নাট্যমন্দির , রঙমহল , এবং শেষে শ্রীরঙ্গম তাঁর এই প্রচেষ্টার ফল । কিন্তু কোনোটিই স্থায়ী হয়নি , একটি জাতীয় রঙ্গালয় , যেখ ানে তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবেন এই ছিল তাঁর চিরজীবনের স্বপ্ন । সেই স্বপ্ন বারবার ভেঙে যাবারদুঃখ তিনি বরাবর বহন করেছেন । ১৯৫৬ সালে তাঁর মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি পাদপ্রদীপের সামনে থেকে সরে এসেছেন ।

তবু ১৯২১ সালের পরবর্তি পঁচিশ বছরকে রঙ্গালয়ের শিশির যুগই বলা হয়ে থাকে । তিনি নতুন যে অভিনেতাদের তৈরী করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পড়েন যোগেশ চৌধুরি , মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য , নরেশচন্দ্র মিত্র , ঝিনাথ ভাদুরী , প্রভা দেবী , কঙ্কাবতি দেবী , প্রভৃতি সমকালে পুরোনো ধারার নাট্যব্যাক্তিত্ব যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় , অহীন্দ্র চৌধুরী , দুর্গাদাস বন্দে াপাধ্যায় ,তিনকড়ি চক্রবর্ত্তি প্রভৃতি । এই কালসীমার মধ্যে মধ্যে মঞ্চব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে । এসেছে আলো ও মাইক । ত্রিশের দশকের শুরুতে সতু সেনের ব্যাবস্থাপনায় এসেছে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ । পৌরানিক নাটকের প্রতি জনতার আকর্ষন কিছুটা কমেছে , তার স্থান নিয়েছে সামাজিক ও ঐতিহাসিক এবং জনপ্রিয় গল্প উপন্যাসের নাট্যরুপ । সব চেয়ে বড় কথা বিনোদনের জগতে ন াটকের সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বি রুপে এসে গেছে সবাক চলচিত্র । সে যুগে নবীন নাট্যকারদের মধ্যে আছেন যোগেশ চৌধুরী , বিধায়ক ভট্টাচার্য, মন্মথ রায় , শচীন সেনগুপ্ত , মহেন্দ্র গুপ্ত , প্রভৃতি । পরের দিকে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় , প্রমথনাথ বিশি , শরদিন্দু বন্দোপ

াধ্যায় , বনফুল , তুলসী লাহিড়ি , দেবনারায়ন গুপ্ত প্রভৃতির নাম পাই ।

।। রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের ব্যাতিত্রম অধ্যায় ।।

বাংলা নাটকের এই দীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথকে ধরা হয় নি তার কারন আছে । রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবন থেকেই অনেক নাটক লিখেছেন ।এমনও নয় যে সাধারন রঙ্গমঞ্চে তাদের অভিনয় হয় নি । বস্তুতঃ তাঁর যে বৌঠাকুরানীর হাট ১৮৮৫ খৃষ্ট াব্দে প্রকাশ হয়েছিল , দেখা যাচ্ছে ১৮৮৬ তেই বসন্ত রায় নাম দিয়ে তার কেদার চৌধুরী কৃত নাট্যরুপ সাধারন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে । এরকম বারবারই হয়েছে । তবু সেগুলিকে রবীন্দ্র নাটক বলা যাবে না । সেকালের প্রত্যক্ষদর্শীদের যে সব টুকরো টুকরো বিবরণ আজ আমাদের হাতে এসে পৌছেচে তাতে বুঝতে পারি ঐ সব প্রজোযনায় রবীন্দ্রনাথের সুক্ষ্ম ইঙ্গিতটুকুই রবীন্দ্রনাথের ক্যা রিকেচার ।আজকেও চলচিত্র দূরদর্শনে অবস্থাটা কি কিছুমাত্র পালটেছে ? আসলে রবীন্দ্রনাটক কাহিনীনির্ভর নয় । তা দাঁড়িয়ে অ াছে ভাবদ্বন্দের উপর । তাকে পরিস্ফুট করতে গেলে যে ধরনের প্রযোজক পরিচালক দর্শক লাগে তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয় । তঁ াদের নিয়ে লাভজনক ব্যাবসা হয় না । তাই রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদের আরও কিছু কাল অপেক্ষা করতে হয়েছি ল যতদিন না ন াটকে শম্ভু মিত্র এবং চলচিত্রে সত্যজিৎ রায় ও তপন সিংহ এলেন ।

কিন্তু সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের কোনো অসুবিধা হয়নি । কারন ভাগ্যক্রমে তাঁর নাটক রুপায়নের জন্য তিনি সাধারন রঙ্গমঞ্চের মুখ াপেক্ষী ছিলেন না ।প্রথম দিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ছাদে স্টেজ বেঁধে পরিবারের লোকজন ও বন্ধুবান্ধবরা অভিনয় করেছেন । তা দেখেছেন কলকাতা শহরের গন্যমান্য আমন্ত্রিতেরা । ঠাকুরবাড়িতে এই অভিনয়ের ধার া তাঁর আগে জ্যোতিরেন্দ্রনাথের অ ামল থেকেই চালু ছিল ।এর পর বিংশ শতকের সূচনায় যখন তাঁর কর্মক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হল তখন থেকে তাঁর নাট্য রচনায় একটা বিরাট দিকপরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি । সাধারন নাটক ছেড়ে তিনি চলে গেলেন সাংকেতিক নাটকের দিকে । ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শারোদোৎসব দিয়ে এই ধারার সূচনা হল ।এগুলিতে একটি করে কাহিনী ও কিছু চরিত্র আছে ঠিকই , কিন্তু তারা যেন খানিকটা বায়বীয় , স্পষ্ট করে তাদের ধরতে ছুঁতে পারা যায় না ।প্রতিক ও সংকেতের অবিরল ব্যাবহারে , সংগীতের প্রাচূর্যে , তির্যক কবিত্বময় ভাষা ব্যাবহারে এই সব নাটকের ভিতরকার জগতটি উন্মোচিত হয় । এই ধরনের অনেকগুলি নাটক রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ।এদের মধ্যে ঈশ্বরসন্ধান থেকে সমসাময়িক বিশ্বের ত্রুর রাজনীতি , সমাজনীতি সবই ব্যত্ত হয়েছে ।রবীন্দ্র প্রতিভার একটি বড় দিক এই নাটকগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথ যদি শান্তিনিকেতনে ছাত্র , শিক্ষক , আবাসিকদের না পেতেন তাহলে এগুলি রচিত ও রুপায়িত হত কিনা সন্দেহ ।এই সব পরীক্ষামুলক নাটকের তারই ছিলেন প্রথন যুগের অভিনেতা ও দর্শক ।শান্তিনিকেতনের মুক্ত প্রকৃতি , ঋতুচক্রের আবর্ত ন , এবং মাটি ঘেঁষা নানান উৎসবের সঙ্গে নাটকগুলি এক সুরে বাঁধা , এগুলিতে দৃশ্যসজ্যার বাহুল্য নেই , এবং অধিকাংশ সময়ে দৃশ্যপরিবর্তনও নেই । অভিনয়ের ভিতরেই আছে স্থান ও কালের অনুভুতি জাগাবার উপাদান ।এইসব কলাকৌশলের মধ্যে শম্ভু মিত্র লক্ষ্য করেছেন দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন । তিরি এবং পরবর্তী কালের গ্রুপ থিয়টারগুলি এইসব কল াকৌশল থেকে অনেক শিক্ষা নিয়েছেন ।

।। নবনাট্য আন্দোলন ঃ অন্য দিগন্ত ।।

আবার ফিরে আসি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কথায় ।বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক শেষ হল , চল্লিশ দশকের সূচনা হচ্ছে ।স ারা পৃথিবীতে সে এক অস্থির সময় ।ইউরোপে চলছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ । আমাদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমবর্ধমান। সধারন রঙ্গালয়ের যাত্রা যেদিন শুরু হয়েছিল তখনকার থেকে সমাজব্যবস্থার ও মানুষের রুচি অনেক বদলে গেছে । সেই বদলের ছাপ পড়েছে সাহিত্যের নানা শাখায় । কিন্তু নাটক মোটামুটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল । ফলে শিক্ষিত পরিনত বুদ্ধির মানুষজনের সঙ্গে তার একটা দুরত্ব তৈরি হয়েছিল , এই পরিস্থিতিতে দেশের মধ্যে অন্যতর নাটকের জন্য একটা আবেগ অনেকেই অনুভব করছিলেন । তারই তাগিদে গড়ে উঠল একটি নাট্য আন্দোলন । প্রথমে ছিল ভারতীয় গন নাট্য সংঘ নামে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী । পরে সেখান থেকেই কিছু সংখ্যক শিল্পপ্রধান ব্যাক্তি বেরিয়ে এসে অন্যতর দল গড়লেন ।ক্রমে অনেক দল হল । বহুরুপী , লিট্‌ল্ থিয়েটার , ক্যালকাটা থিয়েটার , আরও পরে রুপকার , নান্দীকার প্রভৃতিরাএই গোষ্ঠীতে পড়েন । এদের হাতেই আধুনিক গ্রুপথিয়েটারের পত্তন হল , এবং বাংলা নাটকের মোড় ফিরল ।এই বাঁকটাকেই আমরা নবনাট্য আন্দোলন বলতে পারি ।

নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শম্ভু মিত্রের নিজের কথাতেই দেখা যাক কি তাদের অভাববোধ ছিল এবং তারা কি চেয়েছিলেন ? শম্ভু মিত্র লিখছেন " আমরা জানি আমাদের মঞ্চে প্রভূত ক্ষমতাবান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উদ্ভব হয়েছে । কিন্তু এও জানি যে ততখানি গুনসম্পন্ন নাট্যকার আসেননি ।..... বাংলাদেশের অধিকাংশ নাটকই আমাদের অন্বেষায় সাহায্য করে না ।তাতে সেন্টিমেন্ট আছে , কান্না আছে , ছেলেভুলানো গল্প আছে , অর্থাৎ মঞ্চের চাকা চলন্ত রাখবার জন্য যে সব প্রমোদ উপকরন দরকার হয় তারই যোগান আছে ।..... "" একথা স্বীকার করতেই হবে য়ে আমাদের নাটকের ঐতিহ্যের মধ্যে বুদ্ধির ভাগ কম , হ ালকা হৃদয়াবেগ বেশী ।"

এখন এটাতে যাঁদের মন ভরে না সেইসব নাট্যপ্রেমীরা কি করবেন ? যাঁরা নাটক করতে ভালোবাসেন তাঁরা মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা বোধ করছিলেন , আর যে সব দর্শক নাটকে গভীর জীবনবোধের স্বাদ পেতে চান , অথবা চান সমসাময়িক সমাজের বিশ্লেষন ও মূল্যায়ন চান তাঁরা মঞ্চের প্রতি বিমুখ হচ্ছিলেন । ঠিক এই জায়গায় থেকে নবনাট্য আন্দোলন শুরু হল । পথিকৃৎরা চাইলেন এমন নাটক যা করবার সময় তাঁরা , এবং দেখবার সময় দর্শকরা মনের খোরাক পাবেন , শম্ভু মিত্রের ভাষায় " নবনাট্য মানে সেই ন াট্য যেটা জীবন সম্বন্ধে আমাদের গভীরতর বোধ এনে দেবে , সমাজের জটিল স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির সহায়ক হবে । যেটা আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে একসঙ্গে বেঁধে মহৎভাবে বাঁচবার অনুপ্রেরনা দেবে "।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন এঁদের প্রথম সফল প্রযোজনা । তখনও মন্বন্তরের ঘা শুকোয় নি । সেই পটভুমিকায় লেখা এই নাটক এক ধরনের তীব্র সমাজ বাস্তবতা ছিল যা আগেকার যুগের নীলদর্পন নাটকের সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয় , দলগত অভিনয়ের উৎকর্ষে এটি অনন্য ছিল । তার সঙ্গে রুপায়নের ক্ষেত্রে ও এঁরা নতুনত্ব এনেছিলেন । এদের মঞ্চসজ্জায় আগেকার মত আঁকা সিন ছিল না । পুরো মঞ্চটাকে এঁরা মুড়ে দিয়েছিলেন নতুন চটের কাপড়ে । পাদপ্রদীপের আলোয় তাতে মাটির রঙ ধরত । ত ার উপর এখানে ওখানে যৎসামান্য ড্রয়িং করে , বা দুচারটি জিনিস রেখে এঁরচা বুঝিয়ে দিতে চাইলেন ওদিকে আছে ঘড়বাড়ি , বা এদিকে আছে পার্কের রেলিং ইত্যাদি । অভিনয়টি অত্যন্ত সফল হয়েছিল । এবং এই গোত্রের সমাজসচেতন নাটক তাঁরা আরও দু একটি করেছিলেন ।

নবনাট্য আন্দোলনে বিশ্বাসী দল ছিল অনেকগুলি । প্রকৃতপক্ষে এক একটি বড় মাপের নাট্যব্যাক্তিত্বকে ঘিরে এক একটি দল গড়ে উঠল । সেইসব লোকেরা হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভুমিত্র , সবিতাব্রত দত্ত , অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় , উৎপল দত্ত প্রভৃতি । এদের মধ্যে গুনগত উৎকর্ষে , প্রযোজনার বৈচিত্রে ও স্থায়িত্বে শম্ভু মিত্রের বহুরুপীর একটা আলাদা গুরুত্ব আছে । বিশেষতঃ তাঁদের আলাদা কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের নাটকে এযুগে নতুন করে আবিষ্কার করার মধ্যে । তবে তার আগে সে কালের নাট্যচিত্রটিকে একটু দেখে নেওয়া যাক ।

ঊনবিংশ শতকে যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হচ্ছে সেই সময়টায় নাট্যপ্রেমী গোষ্ঠীরা দেখেছিলেন অভিনয় করবার লোক আছে। উপযুক্ত নাটক নেই। সেকালে তাঁরা হাত পেতেছিলেন প্রথমে অনুবাদে, বিশেষতঃ সংস্কৃত নাটকের এবং পরে নাট্যরচনায়। ত ার সঙ্গে উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণও যুক্ত হয়েছিল। শতবর্ষের দরজায় এসে বাংলা থিয়েটারে আবার সেই একই জিনিস ঘটল। এখনকার নাট্যব্যক্তিত্বেরা অনুভব করলেন অনেক নাটক আছে। কিন্তু একালে তাদের আর আবেদন নেই। গিরিশচন্দ্রের ভক্তি ও ভাব ালুতা, বা দ্বিজেন্দ্রলালের অতিনাটকীয় উচচকন্ঠ আদর্শবাদ আর এখনকাব জীবনের সঙ্গে মিলছে না। আধুনিক জীবনবোধের সন্ধানে এঁরা আবার দ্বারস্থ হলেন অনুবাদ নাটকের। এবারকার উত্তমর্ণ ইউরোপ। অনুবাদ ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রচুর বিদেশী নাটক ব াংলায় চলে এল। এ যেমন নীচের মহল (মাক্সিম গোর্কি), পুতুলখেলা, দশচক্র (ইবসেন), নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্রন(পির ানদেল্লা), মঞ্জরী আমের মঞ্জরী (চোভ), তিনপয়সার পালা, গ্যালিলিও, নোয়াইক গেল যুদ্ধে (ব্রেখ্ট), অরদিপাউস (সোফোক্লেস) প্রভৃতি তাদের অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথকেও এঁরা নতুন করে আবিষ্কার করলেন, এবং এতকাল পরে আপন গোষ্ঠীর বাইরে রবীন্দ্রনাটকের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থ াপন সম্ভব হল। শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে বহুরূপী প্রথম মঞ্চস্থ করলেন চার অধ্যায় (১৯৫১), এবং তারপর এল রক্তকবরী (১৯৫৪)। এই দ্বিতীয় প্রযোজনাটি নগণ্যের মতই বাংলা নাট্যজগতে একটি ল্যান্ডমার্ক হয়ে অছে। এঁরা দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নাটকে আধুনিক নাটকে আধুনিক সমাজের কাহিনী আছে। কিন্তু তা ইউরোপীয় ভক্তিতে নয়। আমাদের দেশজ পালাগানের যে অবহমান ঐতিহ্য, খে লা মঞ্চ দৃশ্যপটের পরিহার, বাস্তব গল্পের মধ্যে বিবেক বা নিয়তির মত প্রতীকী চরিত্রের অনায়াস গতায়াত, গান ত্যাদির মধ্য দিয়ে নাট্যবস্তুর আভাস দান, রবীন্দ্র নাথ এইগুলো যুগোচিত পরিমার্জনা সহ ব্যবহার করেছেন। রক্তকরবী নিয়ে চর্চা করতে করতে এগুলে া তাঁরা বুঝে ছিলেন। আলো আবহধবনি, সর্বোপরি অনবদ্য অভিনয় সবকিছু মিলে রক্তকরবীর এতটা অজানা ব্যাখ্যা সেদিন দর্শকের কাছে ফুটে উঠেছিল। সে ব্যাখ্যা নিয়ে পন্ডিতমহলে বিতর্কও জমেছিল প্রচুর। এই বিতর্কই প্রমাণ করে লোকের মনে এই ন াটকের অভিঘাতের গুত্ব। ক্রমে রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা, বিসর্জন, রাজা এগুলিও এঁরা অভিনয় করেছিলেন।

এই সব চলতে চলতেই এসে গেল মৌলিক নাটক। উৎপল দত্তের গণনাট্য সংঘ নানারকম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা ও আন্দোলন সংক্ষোভ ইত্যাদি নিয়ে কিছু নাটক করেছিল। যেমন ফেরারী ফৌজ, অঙ্গার, টিনের তলোয়ার ইত্যাদি। একটু চড়া দ াগের প্রচারধর্মিতা থাকলেও এদের শক্তি অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে অন্য নানারকম নাটকও এই সময় রচিত হয়েছে। ১৯৬২ তে বাদল সরকারের এবং ইন্দ্রজিৎ বাঙালী সমাজে হইচই ফেলে দিয়েছিল। এর দ্বারা মধ্য বিত্ত শ্রেণীর আত্মজিজ্ঞাসায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। বাকি ইতিহাস , ত্রিংশ শতাব্দী প্রভৃতি ও তাঁরই লেখা। শুধু বাংলা নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাদল সরকার এক প্রভাবশালী নাট্যব্যক্তিত্ব। মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অণ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এক ঝাঁক নাট্যকার সত্তরের দশকে এলেন যাঁরা আজও সক্রিয়।

ছোটোবড় এইসব নাট্যদলকে একটা সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে - গ্রুপ থিয়েটার । এঁরা বিষয় ও আঙ্গিকে নবযুগকে বরণ করতে চাইলেন। যথাশক্তি আধুনিক সমাজসচেতনতা ও জীবনবোধ এঁরা উপহার দিতে চেয়েছেন । পৌরানিক কাহিনী কখনও নিয়েছেন তাকে ব্যাখ্যা করেছেচন আধুনিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে , যেমন মারীচ সংবাদ বা ধৃতরাষ্ট্র । সেখানে ঐ চরিত্রগুলির বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্যটাই প্রধান হয়েছে । গুপ থিয়েটারের একটা বড় লক্ষণ তাদের দায়বদ্ধতা । আজ অবস্থাটা হয়ত একটু বদলেছে । কিন্তু সত্তরের দশক পযন্তও এঁরা কায়ক্লেশে বেঁচেছিলেন , এঁদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অর্থাভাব , কারণ এঁদের ন াটকগুলি এক আধটা ভালো বানিজ্য করলেও কোনটিই ঠিক প্রচলিত অর্থে জনপ্রিয় ছিল না । অথচ একটা নাটক কিভাবে মঞ্চস্থ করবার খরচ দিনে দিনে বেড়েছে । শিশিরকুমার ভাদুড়ির মত এঁরাও নিয়ত অভাব বোধ করেছেন উপযুক্ত জাতীয় রঙ্গমঞ্চের যেখানে এঁরা অল্প খরচে নাটকেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারবেন , শম্ভু মিত্রের মত দু একজনের ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু লেখা ছাড়া তঁ াদের আশা স্বপ্ন সংগ্রাম সফলতা বিফলতার পূর্নাঙ্গ ইতিহাস আজও লেখা হয় নি ।

স্বাধীনতার উত্তর কালের পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ

যাই হোক গ্রুপ থিয়েটারের এই বিকাশের যুগে আমাদের পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের কি হয়েছিল দেখা যাক । পেশাদারি থিয়েট ারে একটা বাধ্যবাধকতা থাকে নিত্য নতুন প্রমোদ উপকরণ যুগিয়ে যাবার । গিরিশ যুগে সেটা হত । পরবর্তীকালে ও কিছুদিন হয়েছিল । তারপর স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত কাল থেকে দেখা গেল বাংলা থিয়েটার আর লোক টানতে পারছে না । একে তো পুরোনো ধরনের গতানুগতিক নাটক ও পরিবেশনা । তার ওপর প্রেক্ষাগৃহগুলির জরাজীর্ন অবস্থা । সর্বোপরি চলচিত্রের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিযোগীতার চাপ , স্বল্পব্যায়ের বিনোদন হিসাবে সিনেমার ডুড়ি নেই । রঙ্গমঞ্চের ব্যবহৃত প্রনোদ উপকরণগুলি সবই সেখানে আছে । তার সঙ্গে আরও বেশী অনেক জিনিস আছে । ফলে থিয়েটারগুলি এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ।

এই অবস্থায় স্টার থিয়েটারের তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ একটা সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং তার দ্বারা পেশাদারি থিয়েট ারের মৃতপ্রায় ধমনীতে আরও কিছুকালের জন্য রক্তসঞ্চার হয়েছিল , পদক্ষেপটি হল ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য রঙ্গালয় বন্ধ রেখে কর্তৃপক্ষ গৃহ ও মঞ্চ অদ্যোপান্ত সংস্কার করে নতুন ব্যবস্থাপনায় অনুরুপা দেবীর শ্যামলীর নাট্যরুপ মঞ্চস্থ করলেন । প্রধান ভুমিকাগুলিতে অভিন য় করলেন চলচিত্রের জনপ্রিয় তারকারা । এই শ্যামলীর প্রযোজনায় আশাতীত সুফল ফলেছিল । সুদূর্ঘ আড় াই বছর ধরে পরিপূর্ন প্রেক্ষাগৃহে এই নাটকের একটানা অভিনয় একটা ইতিহাস নিচয়ই । এতদুর সফল না হলেও পঞ্চাশ একশো রজনী অতিক্রম করা কিছু মঞ্চসফল নাটকের নাম এর পর পাওয়া যায় , যেমন সেতু বা আরোগ্যনিকেতন । নাটকগুলিতে বিরাঠ কে ানো অভিনয়ত্ব না থাকলেও পোশাদারি পরিচ্ছন্নতা ছিল । সেই সব নাটকে শধু মঞ্চের নয় , চলচিত্র ও গ্রুপ থিয়েটারের লোকের াও অভিনয় করতেন । ষাট সত্তরের দশকে তাই সিনেমার সমান্তরাল একটি প্রমোদমাধ্যম হিসাবে পেশাদারি থিয়েটারের স্থান ছিল । মাঝে মধ্যে হাতিবাগানের থিয়েটারপাড়ায় সপরিবারে ঘুরে আসার রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল বাঙ্গালী সমাজে ।

।। সমসাময়িক কাল ।।

কিন্তু সে পরিস্থিতি খুব বেশিদিন থাকে নি । একেবারে হাল আমলের বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে কোনো সিদ্দান্ত নিতে গেলে একটা বিভ্রান্তি এসে আমাদের ঘিরে ধরে । দেড়শ বছর আগে যখন প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছিল তখন সেটাই ছিল সর্বসাধারনের একমাত্র বিনোদন । একশো বছর আগে যে সব অন্তঃপুরিকাদের স্বাধীনভাবে কেরাথাও যাবার নিয়ম ছিল না তাঁরাও ঢ়াকা গাড়ি করে থিয়েটারে গিয়ে চিকের আড়ালে বসে নাটক দেখতেন । যখন বাজারে কলের সান এল তখন থিয়েটারের গান ডিস্ক্বাহিত হয়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পৌঁচে গিয়ে থিয়েটারের আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছিল , সেদিন দর্শকের সংখ্যা ছিল কম । কিন্তু যাঁরা নাটক দেখতে চ্যান তাঁরা সকলেই থিয়েটারটাই দেখতেন , পরে জনসংখ্যা বাড়ল । কিন্তু তদনুপাতে দর্শক বাড়ল না । কারণ প্রথমতঃ থিয়েটারের একঘেঁয়েমি , দ্বিতীয়তঃ নতুন প্রমোদ মাধ্যম হিসাবে চলচিচত্রের আবির্ভাব ।ক্রমে বাংলার সঙ্গে হিন্দি চলচিচত্রও এল । তার জৌলুসে মুগ্ধ জনসাধারণের চাহিদাও গেল বদলে , একথা স্বীকার করতেই হবে যে নাটকে যাঁরা মননের স্বদ পেতে চান তাঁদের সংখ্যা চিরকালই মুষ্টিমেয় , যাঁরা সাধারণ দর্শক তাঁরা খুশি হতে চান । খুশি করার সঙ্গে সঙ্গে যে নাটক গভীরতর ভাবনার জগতে নিয়ে যায় , যেমন শেক্স্পিয়রের নাটক , সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ । কিন্তু সেরকম নাটক তো সর্বদা তৈরি হয় না । বাস্তবে দেকা গেল তা হচ্ছে এই যে দর্শককে তুষ্ট করার ক্ষমতা সর্বভারতীয় চলচিচত্রের যতখানি আছে ততখানি ক্ষমতা্য বাংলা ন াটক তো দুরের কথা বাংলা সিনেমারও নেই , তারপর একেবারে হাল আমলে

কেব্ল্বাহিত হয়ে নানাপ্রকার বিনোদন আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে । যার যে রকম রুচি তিনি সেরকম জিনিস বেছে নিয়ে ঘরে বসে দেখছেন । ফলে রঙ্গমঞ্চ কেন , সিনেমা হলগুলিও প্রায়ঃশ ফাঁকা পড়ে থাকছে ।

গ্রামে গঞ্জে এখনও যাত্রার রেওয়াজ আছে । বস্তুতঃ যাত্রার ঐতিহ্য আমাদের অতি প্রাচীন ষাট সত্তরের দশকে এইসব যাত্র াপালার পরিবেশনরীতিতে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল । শান্তিগোপাল তাঁর আধুনিক যাত্রায় হিটলার বা লেলিনের মতদ বড় মাপের ব াজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে রুপায়িত করে শুধু গ্রাম নয় , শহুরে শিক্ষিত সমাজকেও আলোড়িত করেছিলেন । আজকে গ্রামাঞ্চলে যে

ধরণের যাত্রা সাধারণত ঃ হচ্ছে তাতে বৈপ্লবিক কোনো বিষয়বস্তু নেই , বরঞ্চ অলেক আগে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে ধরণের সামাজিক মাটকের অভিময় হত কতকটা সেই শ্রেনীর ভাবালুতাপূর্ন ঘর সংসারের কথাই বলা হচ্ছে । কিন্তু তার প্রয়োগে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে । তাছাড়া অনেক দলেই লোক টানবার জন্য দু একজন চিত্রতারকা আছেন , ফলে একটা গ্রামে যাত্রাপালাগুলি থিয়েটারের অভাব মেটাচ্ছে ।

এইসব নানারকম চাপের মধ্যে পড়ে শহরাঞ্চলের বনেদি পেশাদারি থিয়েটার উঠে যাবার যোগার । দেনার দায়ে , সংস্কারের অভাবে রঙ্গালয়গুলি বিকিয়ে যায় , অথবা পুড়ে যায় কোনো রহস্যময় আগুনে , কিন্তু কী কিন্তু কী প্রানশক্তি বাংলা নাটকের যে তা মরে না । যারা ভালো নাটক করতে চায় ও দেখতে চায় তারা চিরকালই আছে , কারণ সিনেমার দ্বারা নাটকের অভাব পূরণ হয় না , সিনেমা দ্বিমাত্রিক ছবি , তারচ ভাষা আলাদা । আর মাটক ত্রিমাত্রিক ত্রিয়াকলাপ । তার ভাষা ভিন্ন । সেখানে জীবনের অব্যবহিত যে স্পর্শ পাওয়া যায় তার অভিঘাত অনেক বেশি , বালায় এখন অসংখ্য গ্রুপি থিয়েটার রয়েছে । পুরনো আমলের বহুরুপী নান্দীকার রা তো আছেনই । তা ছাড়াও চেতনা , সায়ক , সুন্দরম থিয়েটার সেন্টার , থিয়েটার কমিউন, থিয়েটার ওয়ার্কশপ , থিয়েটারওয়ালা রঙ্গকর্মী ,অন্য থিয়েটার , নান্দীপট , প্রভৃতি বহুল প্রচলিত দল রয়েছে ।

গত বিশ পঁচিশ বছরে আরও বহু দল এসেছে ও গেছে । কলকাতায় এখন অনেকগুলি নতুন মঞ্চ হয়েছে , তাছাড়া মফঃস্বলের প্রধান শহরগুলিতে রবীন্দ্রভবনে জাতীয় মঞ্চ ও রয়েছে । এই সব মঞ্চগুলি অবশ্য শুধু নাটক অভিনয়ের মঞ্চ ময় , সব রকম অনুষ্ঠানই তাতে হয়ে থাকে । তভে তুলনামূলকভাবে ভাড়া কিছু কম বলে অল্পবিত্ত দলগুলি এখানে নাটক দেখাতে সাহস পায় । গ্রুপ থিয়েটারগুলি কলকাতা এবঁ এইসব শহরে তাদের নাটক দেখিয়ে থাকে এবং দেখবারলোকের অভাব হয় না , বলা বাহুল্য এদের অভিনয় নিয়মিত নয় , কিন্তু একই নাটক শত অভিনয় রজনী পার করছে একরম দৃষ্টান্ত কিছু কম নেই । আসলে এখন একশ্রেনীর দর্শক জানে নাটকে আমরা জীবনকে ঠিক যেভাবে দেখতে পাই সেটা সিনেমা , দূরদর্শন, বা যাত্রায় পাব না । আধুনিক গ্রুপ থিয়েটারগুলিতে এখন নানা রকম প্রতীকী কলাকৌশল ব্যবহৃত হয । অকণ্য নদী বা পথ বোধাবার জন্য ঐসব আঁকা দৃশ্যপটের যুগ চলে গেছে । আলো ও মাই কের সাহায্য পাবার ফলে অভিনেতাদেরও আর অতি-অভিনয় করতে হয় না । বরং টিমওয়র্কের ওরপ আগের চেয়ে এখন অলেক বেশি জোর দেওয়া হয় । সব মিলিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের যেগুলি শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা সেখানে মননশীলতা ও সূক্ষ্ম সংবেদনের যথেষ্ট স্থান রয়েছে । চোখের সামনে রক্তমাংসের মানুষেরা একটি মায়াজগৎ তৈরি করল এবং আমরাও অজ্ঞাতসারে সেই জগতের অংশ হয়ে গেলাম নাট্যদর্শনের এই অমৃততুল্য অভিজ্ঞতা এখনও যাঁদের প্রিয় তাঁরাই নাটককে বাঁচিয়ে রেখেছেন ।